Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-II, January2022, Page No.39-45
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

সুকুমার রায়ের লক্ষ্মণের শক্তিশেল : চরিত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ

তনিমা বিশ্বাস
বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Sukumar Roy is one of the unique writers of Bengali literature. He has written his literature with the help of humor. Through this he has highlighted the various mysterious realities of the people of the society. He has composed many poems, including his notable books of poetry such as 'Abol-Tabol', 'Khai Khai' etc. He has written many stories. A part from this, he has also shown skill in composing plays. Lakshan's Shaktisheel Natak is one of his impeccable creations. There is no lack of humor in this play. However, through this, he has basically painted a fair picture of the crooks, flatterers and peddlers of the Rajya Sabha. The author has clearly exposed their lying, blaming others without any reason etc. in front of the eyes of the readers. Through which the real character of several people as well as this special class of people has been exposed to the readers like a picture.

সুকুমার রায় হলেন বাংলা সাহিত্যে জগতের এক উৎকৃষ্ট রত্ন। তিনি ছদ্মনাম, উহ্যনাম, পণ্ডিত সহযোগে তাঁর সাহিত্য রচনা করেন। তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিই হল অনবদ্য। তিনি ‘আবোল-তাবোল’, ‘খাই খাই’ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের পাশাপাশি নানান গল্প রচনা করেছেন। তবে এরই সঙ্গে তিনি নাটক সৃষ্টিতেও নিজস্ব দক্ষতার প্রকাশ করেছেন। মূলত তিনি হাস্যরসের মাধ্যমেই সমাজ, মানব চরিত্র প্রভৃতির বাস্তবকে তুলে ধরেছেন তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে। এইরূপ তার একটি অনবদ্য সৃষ্টি ‘লক্ষণের শক্তিশেল’ নাটক। এর মধ্য দিয়েও সমাজের বিশেষ কয়েকটি শ্রেণির মানুষের চরিত্রের বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি লক্ষ্মণের শক্তিশেল এর চরিত্রগুলি রাম, জাম্বুমান, হনুমান, বিভীষণ, রাবণ, লক্ষণ, যমদূতদ্বয়, যমরাজ। এই চরিত্র গুলির সঙ্গে মূলত বাল্মিকী রামায়ণের মাধ্যমে আমরা প্রথম পরিচিত হই। তবে সুকুমার রায় তার দক্ষতার দ্বারা বাল্মিকী সৃষ্ট চরিত্রগুলির সহযোগে সমাজের বিশেষ রূপকে তুলে ধরেছেন তার এই চার দৃশ্য সমন্বিত নাটকটির মধ্য দিয়ে।

কাহিনির শুরুতেই অর্থাৎ প্রথম দৃশ্যে রামের শিবির-এ দেখা যায় রাম পূর্বরাত্রে স্বপ্ন দেখার কথা সভাসদদের কাছে ব্যক্ত করছেন। যা হলো “... রাবণ ব্যাটা একটা লম্বা তালগাছে চড়ছে। চড়তে চড়তে হঠাৎ পা পিছলে একেবারে প্রপাত চ, মার চ!”[১] এই কথা শুনে রামের অন্যতম এক সভাসদ তথা মন্ত্রী

জাম্বুবানকে "রাজ স্বপ্ন মিথ্যা হয় না"[২] বলতে দেখা যায়। তবে তাতে জাম্বুমান 'হয়তো' শব্দটি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সংশয়ের অবকাশ রাখলেও বাকি সভাসদবৃন্দ রাজস্বপ্ন যে মিথ্যা হয় না তাতে সহমত পোষণ করে স্বীকৃতি দান করেন। তবে রামের স্বপ্ন এখানেই শেষ নয় তিনি আরো জানান "আমি হনুমানকে বললুম যা ব্যাটাকে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে আয়। হনুমান এসে বললে কি ফেলবার দরকার হলো না- সে এক্কেবারে মরে গেছে।"[৩] এইকথা শোনে পুনরায় সভাসদকে "বাঃ বাঃ একদম মরে গেছে ব্যা। আর চাই কি, খুব ফূর্তি কর!"[৪] রামের এই স্বপ্ন বর্ণনার উপর নির্ভর করে তার সভাসদ কর্তৃক এরূপ সহমত পোষণ এর মধ্য দিয়ে রামের মন রক্ষা করার প্রভূত প্রয়াস যথার্থই স্পষ্ট। যেহেতু রাম রাজা তাই রামের মন জুগিয়ে চলা ও রাজা যাতে মনঃক্ষুণ্ণ না হন, সভাসদ কর্তৃক তাই এই আয়োজন। এ সকল আলোচনা সমাপ্ত হওয়ার পরপরই আবার বাইরের গোলযোগ তথা রাবণ সহ রথ দেখা যাচ্ছে শুনে জাম্বুমান কর্তৃক ব্যক্ত করতে দেখা যায় "এই হনুমান ব্যাটাই তো মাটি কললে- তখন রাবণকে সমুদ্রে ফেলে দিলে গোল চুকে যেত- না, ব্যাটা আবার বিদ্যে জাহির করতে গেছে- 'এক্কেবারে মরে গেছে।"[৫] এর মধ্য দিয়ে জাম্বুমান হনুমানকে রাবণের জীবিত থাকার জন্য দায়ী করেছেন তা স্পষ্ট। আবার এও স্পষ্ট যে, রাজার মনের মতো হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষায় জাম্বুমান ভুলেই গেছেন যে বাস্তব ও স্বপ্ন দু'টি পৃথক বিষয়। প্রকৃতপক্ষে বাস্তবের সঙ্গে স্বপ্নের কোনো যোগ থাকে না। সুতরাং রামের স্বপ্ন বা রাবণের বেঁচে থাকা কোনোটাতেই হনুমানের কোনো দায় নেই। এমতাবস্থায় বিভীষণ "চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে"[৬] প্রবাদটির উল্লেখ করেন। অর্থাৎ রাবণ দ্বারে আর এমন সময় জাম্বুমানের পূর্বোক্ত উক্তিটি এই প্রবাদটির সমতুল্য। তবে এই বিভীষণ যে রামায়ণে সৃষ্ট, রাবণের ভাই তা আমরা জানি। আমরা এও জানি রাবণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেই বিভীষণ রামের সহায়ক হন। তাই আজও আমাদের মধ্যে 'ঘর শত্রু বিভীষণ' এই প্রবাদটির প্রচলন রয়েছে। এরপর রাজদূতের আগমন ঘটে ও সে যে রাবণকে সসৈন্য আসতে দেখে তা জানায়। তবে প্রথমে দূতের "আজ্ঞে আমি চানটান করে পুঁইশাক চচ্চড়ি আর কুমড়োর ছেচকি দিয়ে চাট্টি ভাত খেয়ে অমনি বেরিয়েছি - অবশ্যি আজকে পাঁজিতে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ নিষেধ লিখেছিল, কিন্তু কি হলো জানেন? আমার কুমড়োটা পচে যাচ্ছিল কিনা"[৭] উক্তির মধ্য দিয়ে সমাজে যে আসল কথা না বলে প্রবল ভণিতা করে নিজের কথা তথা অপ্রয়োজনীয় কথা বলে এমন লোক বর্তমান তা স্পষ্ট করেছেন নাট্যকার। পরে দেখা যায় এই দূত রাবণকে পথে দেখা ব্যতীত অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য রাম ও তার সভাসদদের দিতে অক্ষম হয়। এরই মধ্যে সুগ্রীব 'রাবণকে ঠেঙাবো' বলে নিজের গদা আনার কথা বলেন। তবে এ দৃশ্যে সকলের শেষে হনুমান 'রাবণ বোধ হয় আসছে'[৮] উক্তির ধারা যথার্থই প্রকৃত সংবাদ প্রদান করেন আমাদের সম্মুখে। হনুমানের এ সংবাদ শুনে তার সংবাদটিকে 'বাসি সংবাদ' বলে রাম সভাসদদের পরিহাস করতে দেখা যায়। এ দৃশ্যের শেষে হনুমান কর্তৃক যথার্থ সংবাদ লাভ করে একমাত্র সুগ্রিবকে রামের সামনেই লক্ষণের উদ্দেশ্যে "চলো হে লক্ষণ, আমরা যুদ্ধ করি গিয়ে"[৯] বলতে দেখা যায়। এর মধ্য দিয়ে সুগ্রীব তার সাহসকে প্রকাশ করেছেন রামের সম্মুখে।

এরপর দ্বিতীয় দৃশ্য ‘রণস্থল’-এ সুগ্রীবকে ভীত ও চিন্তিত হয়ে পদচারণা করতে দেখা যায় ও বিভীষণকে সুগ্রীবের পদচারণার ভঙ্গি ঠিক নয় বলে নতুন ভঙ্গি দেখাতে দেখা যায়। এ নিয়ে উভয় এর কথার মাঝে বিভীষণকে সুগ্রীবকে মানুষ বলতে দেখা যায়। তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে সুগ্রীবকে বলতে দেখা যায় “মানুষ বললে কেন হে? খামটা গালি দিচ্ছ কেন?”[১০] সুগ্রীব চরিত্রটি যে রামায়ণে সৃষ্ট বানররাজ তা আমরা জানি। সেই বানররাজ সুগ্রীবকে বিভীষণ মানুষ বলায় সুগ্রীব নিজেই অপমাণিত বোধ করছেন। এর মধ্য দিয়ে বোঝা যায় মানুষ তার কৃতকর্মের দ্বারাই ‘মানুষ’ সম্বোধনের অধিকার হারিয়েছে। কারণ মান ও হুশের সমন্বয়ে মানুষ শব্দের সৃষ্টি। অর্থাৎ মানুষের মান ও হুশ থাকার কথা কিন্তু বর্তমান সমাজে মানব জাতির মধ্যেই তা দুস্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। এরপর জাম্বুবান রাবণের আগমনের কথা জানালে বিভীষণ ও সুগ্রীবের ‘অ্যাঁ কি?’ [১১] কথাটির মধ্য দিয়ে তাদের ভীতির প্রকাশ ঘটেছে। আবার রাবণের হাতে মার খেলে তাদের মৃত্যু যে অবধারিত তা বুঝেও জেনে চতুর স্বার্থপর বিভীষণকে কাজের অজুহাত দিয়ে পত্রপাঠ বিদায় হতে দেখা যায়। তবে ভীত হলেও সুগ্রীব রাবণের আগমনকালে বলেন, “এইবার বোধ হয় রাবণ আসবে আজ একটা কিছু হয়ে যাবে ইসপার নয় উসপার”[১২]। এর মধ্য দিয়ে সুগ্রীবের যথার্থই রামের প্রতি প্রকৃত আনুগত্যের আপাত প্রকাশ ঘটে। এছাড়া রাবণ তাকে আছড়ে মেরে, ল্যাংড়া করবেন জানালে তিনি ছুঁচো, পাজি বলে তার হাত থেকে রাবণের নিস্তার না পাওয়ার কথাও বলেছেন। তবে তার শেষ রক্ষা হয়নি। রাবণকে এইরূপ কথা বলার কারণে রাবণ ও তাকে ‘শমন সদন’ পাঠাবেন বলে লাঠি দিয়ে প্রহার করে তার মাথা ফাটান। ফলে সুগ্রীব নিজের প্রাণনাশের ভয়ে পলায়ন করেন। মূলত সুগ্রীব সাহসী না হলেও রামের প্রতি আনুগত্যের কারণে মেকি সাহসের পরিচয় দিয়েছেন পাঠকের সামনে, সুগ্রীবের পলায়নের ফলে তা যথার্থই স্পষ্ট। এরপর লক্ষণের সেখানে আগমন ঘটলেও লক্ষণকে দেখে রাবণ বানর দলসহ লক্ষণাদিকে নাশ করবেন বলে লক্ষণকে যুদ্ধে শক্তিশেল দ্বারা বিদ্ধ করেন। ফলে লক্ষণও ভূমিতে পড়ে গিয়ে মূর্চ্ছা যান। এমতাবস্থায় রাবণকে লক্ষণের পকেট লোট করতে দেখা যায়। যা হনুমান রণস্থলে প্রবেশকালে দেখে ফেলেন। ফলে রাবণ পলায়ন করেন। এখানে রাবণের মধ্য দিয়ে ক্ষমতাবান হয়েও লোভী মানুষের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন নাট্যকার সুকুমার রায়। তবে প্রয়োজন ছাড়া স্বভাবদোষে ও যে মানুষ চুরি করে, তা রাজা রাবণের এই চুরির দ্বারা প্রমাণিত। এরপর দেখা যায় এই দৃশ্যের শেষে একদল বানরের আগমন ঘটে রণস্থলে। যারা রাবণের ক্ষমতা ও বুদ্ধির প্রশংসা করলেও রাবণকে “ব্যাটা বেজায় ভুড়ো” [১৩] বলে সম্বোধন করে মূর্ছিত লক্ষণকে নিয়ে প্রস্থান করে। বানর দলই হল সমাজের সকল কার্য সমাপ্ত হবার পরে আগত ব্যক্তি, যারা ঘটনাস্থলের আশপাশে থাকলেও প্রথমে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না, বা দ্বন্দ্ব থামানোর প্রয়াস করে না, দূরের থেকে মজা দেখে, তবে দ্বন্দ্বের শেষে আহতকে যথার্থ স্থানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে বটে ও দ্বন্দ্বের কারণ যথার্থতা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে।

দ্বিতীয় দৃশ্য রামচন্দ্রের শিবির এ পুনরায় রামকে দেখা যায় বাইরের গোলযোগ শুনে শিবিরে থাকা বিভীষণকে তিনি বলেন, “বোধ হয় কোথাও যুদ্ধ বেধে থাকবে”[১৪]। এখানে বিভীষণ রামের কথায় এমন ভাব করেন যেন তিনি রামের রণাঙ্গনে রাবণ লক্ষণ প্রমুখের যুদ্ধের কথা জানেনই না। এমতাবস্থায় রণাঙ্গনে

করা যুদ্ধে আহত সুগ্রীব রামের শিবিরে গেলে বিভীষণ পরিহাস করেন। আবার জাম্বুবান সকল কথা জানা সত্ত্বেও সুগ্রীবকে "মুখে মারিতং জগৎ"[১৫], "ঢাল নেই তলোয়ার নেই খামচা মারেঙ্গা"[১৬] প্রভৃতি বাক্যবাণ এর মাধ্যমে বিদ্ধ করেন। কেউই সুগ্রীবের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেন না। এমনকি রামও এর অন্যথা করেননি। রাবণের বীরত্বকে রামের দ্বারা উপেক্ষা করতে দেখা যায়। "রাবণের কেন বল এত বাড়াবাড়ি

পিঁপড়ের পাখা ওঠে মরিবার তরে"।[১৭]

প্রভৃতি কথার মধ্য দিয়ে রাবণকে তিনি হেয় করার প্রয়াস করেন। তবে জাম্বুবান রাবণের বীরত্ব সম্পর্কে অবগত হয়েও রাজা রামের পদলেহনের উদ্দেশ্যে তাকে সমর্থন করে বলেন-

"রাঘববোয়াল যবে লভে অবসর
বিশ্রামের পড়ে তখনই তো মাথা তুলি
চেং, পুটি যত করে মহা আস্ফালন।"[১৮]

অর্থাৎ জাম্বুবানের কথায় রাম 'রাঘববোয়াল' ও রাবণ 'চেং পুটি'। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জাম্বুবান রাম ও রাবণ উভয়ের বীরত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও রামকে তুষ্ট করার প্রবল প্রচেষ্টা জাম্বুবানের বক্তব্য রয়েছে। তবে জাম্বুবান বা বিভীষণ তাদের কথার বহর বেশিক্ষণ নিজেরাই বজায় রাখতে পারেননি। বাইরের গোলযোগ শুনে সুগ্রীব রাবণের আগমনের অনুমানের কথা বললে বিভীষণ ও জাম্বুবান পালানোর চেষ্টা করেন প্রকাশ্যেই। যার মধ্য দিয়ে তাদের রাবণ ভীতি ও রামের নিকট বলা কথা যে কেবলই বাতুলতা তা প্রমাণিত হয়। এর থেকে বোঝা যায় কোন মানুষ বা প্রাণী তার প্রকৃত চরিত্র বা ব্যবহার কখনো লুকিয়ে রাখতে পারার চেষ্টা করেও সফলতা লাভ করে না তার বহিঃপ্রকাশ অবশ্যই ঘটে। মিথ্যা জাল ছিঁড়ে সত্য সর্বদাই উন্মুক্ত হয় এমতাবস্থায় দূত রামের শিবিরে লক্ষণের আগমন সংবাদ দেয় লক্ষণকে মূলতঃ যে ধরাধরি করে নিয়ে আসা হচ্ছে তা জানায়। তবে এরূপ সময়কালেও রামের পদলেহনকারী জাম্বুবান পুনরায় রামকে তোষামোদ করার উদ্দেশ্যে দূতের কথাকে হেঁয়ালি সম্বোধন করে কান মলে দূতকে তাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলেন। এরূপ অবস্থাতেও সুগ্রীব জাম্বুবান সকলেই হনুমানের উপরই লক্ষণের এ অবস্থার দায় চাপান। আবার সুগ্রীব রাবণ-লক্ষণের যুদ্ধের কালে হনুমান কি করেছিলেন জানতে চাইলে সরল হনুমান বাতাস খাওয়ার কথা বললে সুগ্রীব হনুমানের আটানা জরিমানার আদেশ করেন। এখানে সুগ্রীবকে রাম এর পরিবর্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দেখা যায়। যার মধ্য দিয়ে সুগ্রীবের ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেয়েছে কারণ এ কাজের এক্তিয়ার তার নয়। লক্ষণের এরূপ অবস্থা দেখে দুঃখী রামকে মূর্ছিত হতেও দেখা যায় ও সেই সময়কালেই সুগ্রীবের হনুমানের প্রতি জরিমানার আদেশ বর্ষিত হয়। এরপর যদিও আবার সুগ্রীব রাবণের উদ্দেশ্যে শিক্ষা দান করবেন বলে জানান যা অবশ্যই বিভীষণের উস্কানিতে বলেছেন তিনি। এরপর রামের মূর্ছা ভঙ্গ হলে সভায় রামকে লক্ষণ এর চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ঔষধের কি ব্যবস্থা হয়েছে তা জানতে চাইতে দেখা যায় এবং তখনই সুগ্রীবের লক্ষণ এর চিকিৎসা বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে দেখা যায়। করণীয় কাজের কথা মনে পড়ে। বাস্তব সমাজেও এরূপ মানুষের অভাব নেই যাদের জন্য 'আসল কাজে মুসল নেই ফাও নিয়ে টানাটানি' প্রবাদটি প্রযোজ্য। অন্যদিকে এরূপ চিন্তাগ্রস্ত সময়ে রামের মন্ত্রী জাম্বুবানকে নিদ্রিত হতে দেখা

যায় যা একেবারেই অনভিপ্রেত। এর থেকে মূলত জাম্বুবানের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও মিথ্যাচারই পরিস্ফুট হয়েছে। তা আরো স্পষ্ট হয়েছে তার কাঁচা ঘুম ভাঙানোর কারণে সকলকে ‘বেল্লিক, বেরসিক, বেয়াক্কেল, বেয়াদব,হাড়িমুখো ভূত!’ [১৯] প্রভৃতি গালি দেওয়ার মধ্য দিয়ে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনার দ্বারা জাম্বুবান যে স্বার্থপর বেয়াক্কেল মানুষের প্রতিভূ হয়ে উঠেছেন তা পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন নাট্যকার। এখানে রামকে জাম্বুবান প্রবীণ বলে তার উপর লক্ষণের পথ্য আয়োজন এর বিষয়ে ভরসা করতে দেখা যায়। এমতাবস্তায় ধূর্ত জাম্বুবান তার ঘুমের ঘোরে যে প্রকৃত চরিত্র প্রকাশ ঘটেছে তা বুঝতে পেরে তাকে বহুবার ডাকায় ডাকাত পড়ার অনুমানের কথা উল্লেখ করেন। এরপর জাম্বুবান কে দেখা যায় প্রেসক্রিপশন লিখতে ও সেই প্রেসক্রিপশনে লিখিত বিশল্যকরণী মৃতসঞ্জীবনী আনার দায়ভার পরে হনুমানের উপর। এই দায়িত্ব জাম্বুবান নিজেই হনুমানকে দেন। কিন্তু সরল হনুমান গভীর বনে বন্যপ্রাণী দ্বারা নিহত হওয়ার ভীতি প্রকাশ করে ফেলেন। ঘটনাক্রমে হনুমান তাকে জানান যে তিনি ডাক্তার-খানা চেনেন না। তবে জাম্বুবানের হনুমানকে কৈলাস পর্বত এর পাশে গন্ধমাদন পাহাড়ের হদিশ দেন ও শেষ পর্যন্ত রামের কোথায় তিনি গন্ধমাদন পাহাড়ের উদ্দেশ্যে যান। তবে এরপর জাম্বুবান তার বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন সেনাপতি নির্বাচন করতে বলার মধ্য দিয়ে। কারণ লক্ষণকে নিয়ে যেতে যমদূতের আগমনের সম্ভাবনার কথা তিনি ভেবেছেন। এমতাবস্থায় সুযোগ বুঝে সুগ্রীব বিভীষণের উপর সেনাপতির দায়িত্ব অর্পনের কথা বলে তাকে ফ্যাসাদে ফেলেন। এতে সকলেরই সম্মতিও লাভ হয়। শেষ পর্যন্ত বিভীষণ এ কাজ করতে বাধ্য হলেও তার মধ্যে রাবণ ভীতি অবশ্যই বিরাজ করে। এ ক্ষেত্রে অতি চালাকের গলায় দড়ি প্রবাদটি বিভীষণের জন্য যথার্থ ব্যবহার করা যায়। যা থেকে বোঝা যায় সমাজে চালাকি করেও বিভীষণের মত মানুষের ফ্যাসাদে পড়তে হয়। কারণ তিনি বুদ্ধিধারী বা চতুর ব্যক্তি হলেও তাকে অন্যরাও ফ্যাসাদে ফেলতে সুযোগ অবশ্যই খোঁজেন। এখানে ঠিক যেমন পূর্বে সুগ্রিবকে বিভীষণ ফ্যাসাদে ফেলেন তেমনি তার উপর যথাযথ প্রতিশোধ নেন।

চতুর্থ দৃশ্য শিবির প্রাঙ্গণ এ দেখা যায় বিভীষণ পাহাড়া দিতে দিতে জাম্বুবানের বলা কথা “দেখ যেন ঘুমিয়ো না”[২০] মনে করে বলেন, “এমন অবস্থায় পড়ে যিনি ঘুম দিতে পারেন তাকে আমি ৫০০ টাকা বকশিশ দিতে পারি!” [২১] তবে এরূপ কথা বলেও বিভীষণ অল্প কিছু সময়ের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েন ও পরে জাম্বুবান এসে তাকে ঘুম থেকে ডেকে তুললেন। তবে এমত অবস্থায় বিভীষণ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন সেই সত্যকে ভুল প্রমাণ করার জন্য জাম্বুবানকে জানান তিনি মূলত ঘুমাননি। এরূপ মিথ্যাবাদী মানুষ সমাজের বর্তমান। যারা নির্বিকারে সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বানাতে অভ্যস্ত। এরপর জাম্বুবান প্রস্থান করলেও বিভীষণ পুনঃনিদ্রিত হলে সেখানে দুই যমদূতের আগমন ঘটে। এই যমদূত দ্বয় লক্ষণের দেহ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিভীষণের উপর পড়লে বিভীষণের নিদ্রা ভঙ্গ হয় ও তাদের উদ্দেশ্যে তাকে ‘কেরে!’ বলে জিজ্ঞাসা সূচক শব্দ ব্যবহার করতে দেখা যায়। তখন তারা বিভীষণকে নিয়ে যেতে এসেছে মনে করে তাকে জীবিত দেখে ভীত হয়। তবে পরে তারা তাদের ভুল ভাবনার কথা বুঝতে পারে। মূলত সমাজের অসহায় মানুষের প্রতি এই যমদূত ও বিভীষণ এখানে দুর্বল মানুষের উপর অত্যাচারকারী মানুষের

প্রতিভু। তাই বিভীষণ তারা না গেলে মেরে ধনঞ্জয় করে দেবে বলেন। এমতাবস্থায় তারা পালাতে উদ্যত হলে তাদের মনে পড়ে কার্য সম্পন্ন করে না গেলে তাদের যমরাজ আস্ত রাখবে না। এক্ষেত্রে তারা পরে উভয় সঙ্কটে। চাকরি বাঁচাতে প্রথম দূতকে বিভীষণের সঙ্গে লড়াই করার প্রস্তাব দিতে দেখা যায় দ্বিতীয় যমদূতের উদ্দেশ্যে। কিন্তু লড়াই করলে যে তাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী তাও তারা জানে। এর মধ্য দিয়ে সাহিত্যিক যথার্থই সমাজের ক্ষমতাশালী বা বিত্তবান শ্রেণির যাঁতাকলে আবদ্ধ দুর্বল অসহায় চাকরিজীবীর ছবি তুলে ধরেছেন। তবে এরপর চালাক বিভীষণের দুর্ভাগ্যক্রমে এই দুই যমদূতের মতই অবস্থা হয়। কারণ সেখানে যমরাজের আগমন ঘটে ও বিভীষণ উভয়সঙ্কটে পড়েন। তবে যমরাজ তার দিকে অগ্রসর হলে আচমকাই নিজের অজ্ঞাতেই হনুমান গন্ধমাদন পাহাড় তার মাথায় স্থাপন করেন ও যমের পতন ঘটে। এ ঘটনাও বিভীষণের ন্যায় দুর্বৃত্তের ভাগ্যের ফল। যমরাজের এ অবস্থা দেখে সুযোগ বুঝে বুদ্ধিমান জাম্বুবান লক্ষণকে নিয়ে তাকে সুস্থ করার প্রচেষ্টা করেন। তবে যমদূতদ্বয় যমরাজের কাছে চাকুরীরত হওয়ায় যমরাজ না থাকলে মাইনে পাবে না ভেবে ক্রন্দন করে। এভাবে রামায়ণের ন্যায় হনুমান বিশল্যকরণী না পেয়ে সমগ্র পাহাড় তুলে এনে পুনরায় তার সরলতা ও বলের প্রমাণ দিয়েছেন। আবার অন্যদিকে লক্ষণ সুস্থ হলেই যমকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এখানে বাস্তব সমাজের মত কাউকে আটক করে কার্যসিদ্ধি করার চিত্র ফুটে উঠেছে। মূলত যমকে এখানে বোকা বানানো হয়েছে। ফলে সঠিক কাজের হিসাব পেলেও তিনি মনে করেন চিত্রগুপ্ত তাকে ভুল হিসাব দিয়েছেন। এরপর শেষে শুরু হয় লক্ষণের শক্তিশেল থেকে লক্ষণকে উদ্ধারের ক্রেডিট নেওয়ার পালা। একে একে হনুমান সুগ্রীব বিভীষণ জাম্বুবান রাম এমনকি এতে সামিল হন। সবশেষে হনুমানের গন্ধমাদন পাহাড় আনার মতো বিশাল কাজের জন্য তাকে চারটি বাতাসা দেওয়ার কথা বলার মধ্য দিয়ে সমাজের বড় কাজের যথাযোগ্য সম্মান বা মূল্য যে কেউ পায় না তা যথার্থই চিত্রিত হয়েছে।

সমগ্র কাহিনীর মধ্য দিয়ে আমরা ক্ষমতাবান মানুষের পদলেহনকারী চাটুকার চরিত্রের চিত্র মূলত দেখতে পাই। এই পদলেহনকারী হলেন জাম্বুবান রাবণের বিশ্বাসঘাতক ভাই বিভীষণ যে অবশ্যই স্বার্থপর ও প্রবল সুযোগসন্ধানী এবং সুগ্রীব। রাজা রাম এখানে অবশ্যই ক্ষমতাশালীদের প্রতিভূ। রাম এখানে শুধু রাজাই হয়েছেন তার কোনো দায়িত্ববোধ এর দৃষ্টান্ত নেই এ কাহিনিতে। তবে রাবণ যে যথার্থই বীর তা নাট্যকার বুঝিয়েছেন। কিন্তু রাবণকে এখানে লোভী সুযোগসন্ধানী হতে দেখা গেছে। লক্ষণের শক্তিশেল বিদ্ধ হওয়ার পর তার পকেটে লুট করার মধ্য দিয়ে। এছাড়া সহজ-সরল হনুমান দুর্বল অসহায় চাকরিজীবী ক্ষমতাবান বোকা যমরাজ চরিত্র এই কাহিনীতে বর্তমান। এ কাহিনির প্রতিটি চরিত্রই সমাজে কোনো না কোনো বিশেষ চরিত্রের মানুষের প্রতিভূ হয়ে উঠেছেন নাট্যকার সুকুমার রায় তাঁর এই রচনাকে হাস্যরসের মাধ্যমে উপস্থাপন করলেও এর মধ্য দিয়ে সমাজের মানবচরিত্রের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন যা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

তথ্যসূত্র:

১. সুকুমার রচনা সমগ্র (অখন্ড সংস্করণ) শুভম, প্রথম প্রকাশ ১৪১২, কলকাতা, ৭৩২৫৬

২. তদেব, পৃষ্ঠা নং-২৫৬।

৩. তদেব, পৃষ্ঠা নং-২৫৬।

৩. তদেব, পৃষ্ঠা নং-২৫৬।

৪. তদেব, পৃষ্ঠা নং-২৫৬।

৫. তদেব, পৃষ্ঠা নং-২৫৬।

৬. তদেব, পৃষ্ঠা নং-২৫৬।

৭. তদেব, পৃষ্ঠা নং-২৫৬।

৮. তদেব, পৃষ্ঠা নং-২৫৭।

৯. তদেব, পৃষ্ঠা নং-২৫৮।

১০. তদেব, পৃষ্ঠা নং-২৫৮।

১১. তদেব, পৃষ্ঠা নং-২৫৮।

১২. তদেব, পৃষ্ঠা নং-২৫৮।

১৩. তদেব, পৃষ্ঠা নং-২৬০।

১৪. তদেব, পৃষ্ঠা নং-২৬০।

১৫. তদেব, পৃষ্ঠা নং-২৬০।

১৬. তদেব, পৃষ্ঠা নং-২৬০।

১৭. তদেব, পৃষ্ঠা নং-২৬০।

১৮. তদেব, পৃষ্ঠা নং-২৬০।

১৯. তদেব, পৃষ্ঠা নং-২৬২।

২০. তদেব, পৃষ্ঠা নং-২৬৪।

২১. তদেব, পৃষ্ঠা নং-২৬৪।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. সুকুমার রচনা সমগ্র (অখণ্ড সংস্করণ০, শুভম্, প্রথম প্রকাশ-১৪১২, কলকাতা-৭০০০৭৩।

২. সুকুমার সমগ্র, সম্পাদক: সুনীল জানা, দশম সংস্করণ: জ্যৈষ্ঠ ১৪২১, প্রকাশক-সুধাংশু শেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩।

৩. সুকুমার রায়: জীবন কথা, হেমন্ত কুমার আঢ্য, পুস্তক বিপনী, কলকাতা, ১৯৯০।

৪. সুকুমার রায়: লক্ষ্মণের শক্তিশেল: sukumarray.freehostea.com

৫. সুকুমার রায়: wikipedia